The Chittagong University Journal of Social Sciences Vol. 35, 2026 (P. 288-311)

নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন: একটি বিশ্লেষণ

মোহাম্মদ আলী[১]

[**সংক্ষিপ্তসার:** ষাটের উত্তাল সময়ে দেশ ও দশের প্রতি গভীর মমত্ববোধের কবিতা নিয়ে বাংলাদেশের কবিতায় নির্মলেন্দু গুণের (১৯৪৫-) আবির্ভাব। মানুষ, মানবিকতা, প্রেম-দ্রোহ, কাম, দেশাত্মবোধ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা গুণের কবিতার প্রধান উপজীব্য। রাজনৈতিক সচেতন গুণের কবিতার স্বতন্ত্র স্বর জুড়ে রয়েছে এদেশের পলিমাটির ঘ্রাণ, সাধারণ মানুষের জীবন-যাপন ও সংগ্রাম। তাঁর কবিতায় ওঠে এসেছে সার্বিক মানব মুক্তি, সাম্য ভিত্তিক ও শোষণ মুক্ত সমাজ নিমার্ণের বার্তা। সাম্যবাদী এই কবির কবিতার অন্তরআত্মা জুড়ে রয়েছে চিরায়ত বাঙালির সংগ্রাম থেকে শুরু করে নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তের চিন্তা ও জীবনধারার রূপান্তর। বিগত চুয়ান্ন বছরের বাংলাদেশের উত্থান-পতনের পাশাপাশি আমাদের সমাজ জীবনের পরিবর্তনের নানা সাক্ষ্য বহন করে গুণের সমাজবাদী নির্মলেন্দু গুণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমানাধিকারের বার্তা দিয়ে গেছেন কবিতায়। আধুনিক পৃথিবীতে সাম্যবাদ একটি রাজনৈতিক দর্শন ও অন্যতম বিশ্ববীক্ষা; শোষিত-বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের আকাঙ্ক্ষিত জীবনদর্শন। আমাদের শ্রেণিভিত্তিক সমাজের অভ্যন্তরীণ শ্রেণিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতি নিয়ত বিরাজমান। মার্কসবাদে প্রভাবিত কবি চেতনে–অবচেতনে প্রভাবিত মার্কসবাদী সাম্যবাদ দ্বারা। ফলে তাঁর কবিতার অন্যতম আবেদন হয়ে ওঠে আমাদের যাপিত সমাজ ও মানুষ। আলোচ্য গবেষণা আমরা গুণের কবিতার সাম্যবাদী ধারাটি তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছি। প্রবন্ধটি রচনায় বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উভয় ধরনের উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে গবেষণা প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য হিসেবে নির্মলেন্দু গুণের সকল কবিতা হতে সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন হয়েছে এমন কবিতাগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।]

চাবিশব্দ: সাম্যবাদ, বাংলা কবিতা, মানবমুক্তি, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, শ্রেণিবৈষম্য, বিপ্লব।

ভূমিকা

নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় সাম্যবাদী ভাবনা গভীরভাবে প্রতিফলিত। তাঁর কবিতায় সমাজের শোষিত ও বঞ্চিত শ্রেণির প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে এবং সমাজের অসাম্য, শোষণ, ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। কৃষক, শ্রমিক, এবং মেহনতি মানুষের সংগ্রাম তাঁর কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। গুণের কবিতা শোষণমুক্ত, সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখায়। পুঁজিবাদী সমাজের অন্যায় কাঠামোর সমালোচনা এবং বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার তাগিদ তাঁর লেখার গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাঁর কবিতাগুলো মানবিকতা, ভালোবাসা এবং ন্যায়বিচারের পক্ষে শক্তিশালী অবস্থান

[১] সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইল-malictg007@gmail.com

নেয়। 'স্বাধীনতা এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো', 'মানুষ' ইত্যাদি কবিতায় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি সামাজিক সাম্যের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দিকেও তিনি মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁর কবিতা শুধু সাহিত্য নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের জন্য একটি শক্তিশালী আন্দোলনের অংশ, যা বাংলা সাহিত্যে সাম্যবাদী দর্শনের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

সাম্যবাদের উত্থান এবং বিকাশ একটি দীর্ঘ এবং জটিল প্রক্রিয়া। সাম্যবাদ একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দর্শন, যার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে শ্রেণিসংগ্রাম, পুঁজিবাদী শোষণ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারণা । এর সূচনা ঘটে উনিশ শতকে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের মাধ্যমে, যাঁরা "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" (১৮৪৮) প্রকাশ করে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজ পরিবর্তনের আহ্বান জানান। ইতিহাসে তাঁকে 'ইউটোপিয়ান' সমাজতন্ত্রী নামে অভিহিত করেছে (মুখার্জী, ১৯৭২) । কারণ ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে এমন কিছু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল সেগুলোতে সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার নানাচিত্র ফুটে উঠেছিলে। মার্কসবাদী তত্ত্ব অনুযায়ী, পুঁজিবাদ একটি শোষণমূলক ব্যবস্থা, যা এক সময় শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের মাধ্যমে পতিত হবে এবং একটি সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠবে। তাদের তত্ত্ব, যা শ্রেণিসংগ্রাম এবং পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ছিল, সমাজের পরিবর্তন ও শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায় (রায়, ২০১৭)। আধুনিক যুগে, সাম্যবাদ কেবল অর্থনীতি নয়, পরিবেশ, লিঙ্গ, বর্ণ এবং সামাজিক ন্যায়ের বিষয়েও নতুন চিন্তা উদ্ভাবন করে, যা সাম্যবাদকে মানবিক এবং বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে (রেজা, ২০২৪)। উনিশ শতকের শিল্পায়ন, শ্রমিক শ্রেণির উত্থান ও সামাজিক বৈষম্য এই তত্ত্বের ভিত্তি নির্মাণে সহায়ক হয়।

মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বের মাধ্যমে পুঁজিবাদের শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধতায় সাহিত্যকে একটি শক্তিশালী প্রতিবাদী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বার্টোল্ট ব্রেখট, রেমন্ড উইলিয়ামস এবং লুই আলথুসারের মতো তাত্ত্বিকেরা সাহিত্যে শ্রেণি, ক্ষমতা এবং মতাদর্শের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ শতকে, রোজা লুক্সেমবার্গের মানবিক অনুভূতি এবং কবিতার মধ্যে নৈতিক সংহতির চেতনা দেখা যায়। সাম্যবাদের সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বে কবিতা এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তা একে অপরকে ধারণ করেছে, এবং রোমান্টিকতা ও বিপ্লবী চেতনার সংমিশ্রণে একটি নতুন সাহিত্যিক আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে (রহমান, ২০১৩)।

বিশ্বব্যাপী বিশ শতকীয় মার্কসবাদের উত্থান বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছে বিবিধ ব্যঞ্জনা। মার্কসবাদে প্রভাবিত বাঙালি কবি-লেখকদের রচনায় চেতনে-অবচেতনে প্রকাশিত হয়েছে মার্কসীয় সাম্যবাদ (শিপু, ২০২২)। বাংলা কবিতায়, বিশেষত কাজী নজরুল

ইসলাম, শামসুর রাহমান, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের,আল মাহমুদ, বিষ্ণু দে, সমর সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অরুণ মিত্র, কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুকান্ত ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু গুন প্রভৃতির কবিতায় সাম্যবাদী ভাবনার উত্থান ঘটে, যেখানে শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি, সাম্য এবং শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠে আসে (সুকান্ত, ২০১৬)। তাছাড়া, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার সংগ্রামে কবিরা জনগণের সংগ্রাম তুলে ধরেছেন এবং সমাজে বিরাজমান অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। সাম্যবাদী চিন্তা ও সাহিত্য একে অপরকে ধারণ করে একটি নতুন সাহিত্যিক আন্দোলন সৃষ্টি করেছে, যা সমাজের পরিবর্তন এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে গুণের কবিতা এগিয়েছে। ষাটের জাতীয়তাবাদী সময়ের উত্তাল দিনগুলো থেকে শুরু করে বিগত চুয়ান্ন বছরের ইতিহাসে তাঁর কবিতা আমাদের জাতীয় জীবনে অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে (মণ্ডল, ২০২৩)। আজকের এই বাংলাদেশ নির্মিতির পেছনে রয়েছে অনেক সংগ্রাম ও রক্তপাত। বাঙালির সংকটকালে গুণের কবিতা আমাদের তারুণ্যের সংগ্রাম-বিপ্লবে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে (খান, ২০১৪)। তাঁর কবিতায় ওঠে এসেছে ষাটের দশক থেকে আমাদের সমাজের শ্রেণিবৈষম্য, শাসক শ্রেণির শোষণ, আন্দোলন-সংগ্রাম তথা বাঙালির সমাজজীবন (ওয়াদুদ, ২০২৩)। গুণের কবিতা নিয়ে নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে। আমিনুর রহমান সুলতানের ‘রাজনৈতিক চেতনা বাংলাদেশের কবিতা’(১৯৯৪) গ্রন্থের ‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট’ ও ‘বাংলাদেশের কবিতায় রাজনৈতিক চেতনা’ শীর্ষক অধ্যায়ের আলোচনায় বাঙালির সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক চেতনার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারে গুণের কবিতার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। উক্ত গ্রন্থটিতে গুণের কবিতার ঐতিহ্য ও তার উত্তরাধিকারের স্বরূপ সন্ধান করাও হয়েছে। পাশাপাশি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপ্রেক্ষিত ও প্রকৃতি, স্বৈরাচারবিরোধী ও গণআন্দোলনমুখী কবিতা আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠায় যে অগ্রণী ভূমিকা তা তুলে ধরা হয়েছে।

> উনিশ শ' আটষট্টি সালের পর থেকে পূর্ববাংলায় অমানবিক পরিস্থিতি নেমে আসে। পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ হুলিয়া মাথায় নিয়েই স্বদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রত্যাশা করেছেন। নির্মলেন্দু গুণের ‘হুলিয়া’ এ জাতীয় রাজনৈতিক কবিতা। (আমিনুর রহমান সুলতান, ১৯৯৪)

রিষিণ পরিমলের ‘কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ’(২০১৬) গ্রন্থে আমাদের সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত, বুদ্ধিজীবী-হত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞানে নির্মলেন্দু গুণের কবিতার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। খোন্দকার আশরাফ হোসেন ‘বাংলাদেশের কবিতা: অন্তরঙ্গ অবলোকন’(১৯৯৪) গ্রন্থে ‘গুণের কবিতার দোষগুণ’ শীর্ষক অধ্যায়ে গুণের কবিতার প্রেম ও বিপ্লবের ভাণ্ডারে

চিরুনি অভিযান চালান। 'নির্মলেন্দু গুণ প্রেমের কবিতায় সহজিয়া উচ্চারণের সাধক' (খোন্দকার আশরাফ হোসেন, ১৯৯৪)। বর্তমান বাস্তবতায় গুণের কবিতায় সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নিয়ে কাজ হয়নি বলে আমরা মনে করি। ফলে এই কাজটি তাঁর কবিতার নতুন একটি দিক নির্ণয়ে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। সমাজবাদ এমন এক মতবাদ, যা সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সাম্য, ন্যায়বিচার এবং শোষণমুক্ত পরিবেশের জন্য কাজ করে। নির্মলেন্দু গুণের কবিতার অন্যতম মূল সুর সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি সহানুভূতি এবং তাঁদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় নিহিত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সাহিত্যের মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় সাম্যবাদী ভাবনার গভীরতা ও বৈচিত্র্যতা অনুসন্ধান করা এবং এর সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা। পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে সাম্যবাদী দর্শনের বিকাশে তাঁর অবদান এবং তাঁর কবিতার বার্তা সমকালীন সমাজে কতটা প্রাসঙ্গিক তা বিশ্লেষণ করা। গবেষণার মাধ্যমে কবিতার মধ্য দিয়ে সমাজের বৈষম্য, শোষণ এবং বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার যে আহ্বান তিনি তুলেছেন, তা নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা রয়েছে। কবিতায় সাম্যবাদী ভাবনা ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা এক গুরুত্বপূর্ণ ধারা। নির্মলেন্দু গুণের কবিতা এই ধারায় অসাম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে। তাঁর রচনায় শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিফলন পাওয়া যায়, যা সাহিত্যকে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মূল্যবান করে তোলে। এই গবেষণায় নির্মলেন্দু গুণের কবিতার মধ্য দিয়ে যে সাম্যবাদী ভাবনার প্রতিফলন ঘটে, তার সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করাই মূল উদ্দেশ্য।

গবেষণার পদ্ধতি

গবেষণামূলক সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় সাম্যবাদী ভাবনার বিশ্লেষণ করতে তাঁর রচিত কবিতা, প্রবন্ধ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সাহিত্যকর্ম অধ্যয়ন করা হয়। প্রাথমিক তথ্য হিসেবে নির্মলেন্দু গুণের কবিতাগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন স্পষ্ট হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় কবিতার বিষয়বস্তু, ভাষা, উপমা, প্রতীক এবং তাত্ত্বিক ধারণাগুলোর সঙ্গে সাম্যবাদী দর্শনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়। পাশাপাশি, সামসাময়িক সাহিত্যিকগণের রচনার সঙ্গে তুলনা করে নির্মলেন্দু গুণের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য ও সাম্যবাদী চিন্তার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়। নির্মলেন্দু গুণ বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা কবি, যাঁর কবিতায় সমাজচেতনা, শ্রেণিসংগ্রাম এবং সাম্যবাদী ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি কবিতাকে নান্দনিকতার বাইরে এনে

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের জীবন, বৈষম্য, শোষণ এবং পুঁজিবাদী সমাজের অসাম্যের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতা দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। এই প্রবন্ধে তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক দর্শনের প্রতিফলন বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে, যা বাংলা সাহিত্যে সমাজভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় উপস্থাপন করে। এই পর্যালোচনা পদ্ধতি নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় সাম্যবাদী দর্শনের গভীরতা এবং প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবনে সহায়ক হবে।

গবেষণার পদ্ধতিগত উপকরণ

গবেষণায় নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় সাম্যবাদী ভাবনার বিশ্লেষণের জন্য তিনটি মূল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত, পাঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কবিতার ভাষা, রূপক ও প্রতীকের মাধ্যমে সাম্যবাদী চেতনার প্রকাশ খুঁজে দেখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে কবিতাকে আর্ন্তজাতিক বিষয়াবলি, মুক্তিযুদ্ধ, নকশাল আন্দোলন ও গ্রামীণ সংকটের মতো ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। তৃতীয়ত, তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে গুণের কাব্যচেতনার তুলনা করা হয়েছে প্রাসঙ্গিক কবিদের সঙ্গে। এই তিনটি পদ্ধতি মিলিয়ে কবিতার ভাব, প্রেক্ষিত ও স্বাতন্ত্র্য বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে। গবেষণার ফলাফল সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ ও রাজনীতির আন্তঃসম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে।

গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো

নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় সমাজবদ্ধ, রাজনৈতিক ও শ্রেণিসচেতন এক বিপ্লবী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়। তাঁর কবিতার ভাষা সহজ, তবে বেদনাবিধুর বাস্তবতা ও প্রতিবাদের ধারালো ছাপ রেখে যায়। এই গবেষণায় কবিতায় বিদ্যমান সাম্যবাদী ভাবনার বিশ্লেষণের জন্য দু'টি সাহিত্যিক তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়েছে-মার্কসবাদী সাহিত্য তত্ত্ব এবং সামাজিক বাস্তবতাবাদ। এই তত্ত্বদয়ের আলোকে কবির কবিতায় সমাজ, শ্রেণি এবং বাস্তবতার প্রতিফলন বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ক. মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্ব

মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্ব মূলত কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে নির্মিত। এই তত্ত্বে সাহিত্যের ভেতরকার শ্রেণিসংগ্রাম, মতাদর্শিক নিয়ন্ত্রণ এবং শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা চিহ্নিত করা হয়। লুই আলথুসারের 'আইডিওলজির রাষ্ট্রযন্ত্র' ও টেরি ঈগলটনের সাহিত্য বিশ্লেষণ এই তত্ত্বকে আরও সম্প্রসারিত করেছে।

খ. সামাজিক বাস্তবতাবাদ

সামাজিক বাস্তবতাবাদ সাহিত্যকে সমাজের বাস্তবতা, বিশেষ করে শ্রমজীবী ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরার একটি কৌশল হিসেবে বিবেচনা করে। এটি কোনও রূপক বা অলৌকিকতার আশ্রয় নেয় না, বরং বাস্তবতা ও বঞ্চনাকে সরাসরি উপস্থাপন করে।

গ. তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

বিষয়ের দিক	মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্ব	সামাজিক বাস্তবতাবাদ
মূল লক্ষ্য	শ্রেণিসংগ্রাম, দমন, শোষণ, বিপ্লব ও প্রতিরোধ	সমাজের বাস্তবচিত্র ও মানবিক যন্ত্রণার ভাষ্য
বিশ্লেষণের প্রকৃতি	রাজনৈতিক, শ্রেণিভিত্তিক ও মতাদর্শিক	সমাজভিত্তিক, বাস্তব জীবনভিত্তিক সাহিত্যপাঠ ও মানবিক অভিজ্ঞতা
সাহিত্যের ভূমিকা	মতাদর্শের প্রতিফলন, সামাজিক দ্বন্দ্ব, শোষণ ব্যবস্থা ও ক্ষমতার কাঠামোর উন্মোচন	সমাজ-বাস্তবতার প্রতিচিত্র ও সমাজের নিচুতলার কণ্ঠস্বর তুলে ধরা
কেন্দ্রীভূত বিষয়	মতাদর্শ, আধিপত্য ও শ্রেণিবিভক্তি	দরিদ্রতা, সংগ্রাম ও সামাজিক বঞ্চনা
ভাষার ধরন	রূপক, আদর্শগত, প্রতীকি ও প্রতিবাদমুখী	সরল, বর্ণনামূলক, জীবনঘনিষ্ঠ ও বাস্তবভিত্তিক
নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় প্রতিফলিত বিষয়	শ্রেণিচেতনা, শোষণ, শ্রমজীবীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, বিপ্লবীকণ্ঠ, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, রাজনৈতিক চেতনা ও বিশ্বাস	সংগ্রামী জীবনের বাস্তবচিত্র, ব্যক্তিগত সংগ্রাম, দরিদ্রতা, মানবিক যন্ত্রণা ও আত্মপরিচয়ের বাস্তব রূপ

ছক: মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সামাজিক বাস্তবতাবাদের তুলনা।

নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় সাম্যবাদী ভাবনা

নির্মলেন্দু গুণের কবিতার সাথে মার্কসবাদের সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের বিষয়। নির্মলেন্দু গুণ একজন প্রগতিশীল চিন্তাধারার কবি হিসেবে পরিচিত, এবং তাঁর অনেক কবিতায় মার্কসবাদী দর্শনের প্রভাব লক্ষ করা যায় (শিপু, ২০২২)। মার্কসবাদের মূল ভিত্তি হলো শ্রেণিসংগ্রাম ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। নির্মলেন্দু গুণের অনেক কবিতায় এই শোষণবিরোধী অবস্থান স্পষ্ট। তিনি শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-কষ্ট, তাদের প্রতি রাষ্ট্র বা উচ্চবিত্তের অবহেলা, এবং তাদের অধিকার

আদায়ের আহ্বান জানিয়েছেন। সুন্দর শ্রেণিবৈষম্যহীন এক পৃথিবীর জন্য কবি অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে আছেন। তাঁর কবিতায় মায়ামমতা অস্তিত্বের সংকট উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নিদারুণভাবে (ইসলাম, ২০২৩)। নেকাব্বর এই পুঁজিবাদী সমাজের আগ্রাসনের সমূহ শিকার। আবার ফাতেমার প্রেমের জন্য কাঙাল নেকাব্বর। নেকাব্বর অন্ত্যজশ্রেণির প্রতিভূ। নেকাব্বরের জীবনাবসান যেন সমগ্র পৃথিবীর প্রান্তিক মানুষকে ম্যাসেজ দেয় যে এই বুর্জোয়া জাতিরাষ্ট্র-সমাজ প্রান্তিক মানুষের লাশ নিয়েও রাজনীতি করে যায়। এখানে কবি বুর্জোয়া সমাজের কদর্যতা দেখিয়েছেন অত্যন্ত দক্ষ হাতে। নির্মলেন্দু গুণ দ্রোহ-প্রেম একসঙ্গে মিলিয়ে যেসব কবিতা রচনা করেন তা আমাদের জীবনের গল্প। 'ক্ষেতমজুরের কাব্য' থেকে উদ্ধৃত হলো-

কাতর কণ্ঠে বধূটি শুধালো :
'আইছ্যা ফুলির বাপ,
আমাগো একটু জমিন হবে না?
জমিন চাওয়া কি পাপ?'
'খোদার জমিন ধনীর দখলে
গেছে আইনের জোরে,
আমাগো জমিন অইব যেদিন
আইনের চাকা ঘোরে।'
অসহায় বধূ জানে না নিয়ম (গুণ, ১৯৯৫)

এই ধরনের পঙ্ক্তিতে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম ও আত্মপরিচয়ের বিষয়টি ফুটে ওঠে-যা সরাসরি মার্কসবাদী আদর্শের সাথে মেলে। নির্মলেন্দু গুণ কবিতায় সমাজ পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন, যা মার্কসবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনি বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তনে বিশ্বাস করেন এবং বিপ্লবকে আশাবাদী দৃষ্টিতে দেখেন (জনকণ্ঠ, ২০১৯)। মার্কসবাদের একটি মৌলিক দিক হলো ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবতাবাদ। নির্মলেন্দু গুণের লেখায় অনেক সময় ধর্মীয় গোঁড়ামির সমালোচনা পাওয়া যায় এবং তিনি মানবতাকে প্রধান বলে মেনে চলেন-যা মার্কসবাদী মূল্যবোধের সাথে মিল রাখে। নির্মলেন্দু গুণ মার্কসবাদ ও সাম্যবাদ দ্বারা কতটা প্রভাবিত-তার প্রমাণ মেলে একজন গবেষকের কাছে দেওয়া সাক্ষাৎকারে, যেখানে তিনি বলেন, "মার্কসবাদকে যদি তুলনামূলকভাবে বৈষম্যহীন সাম্যবাদী দর্শনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করি, তাহলে বলতে পারি প্রতিটি মানুষই জন্মগতভাবে মার্কসবাদী। মানুষ সাম্যবাদী হিসেবেই জন্মগ্রহণ করে (চক্রবর্তী, ২০২৩)।"

যুগধর্ম , সমাজ ও সমকালের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া পৃথিবীর যেকোনো দেশের যেকোনো লেখকের চিরকালীন বৈশিষ্ট্য। মৌলিক অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার কারণেই সাম্যবাদী ধারণার উন্মেষ ঘটেছে। মার্কসবাদীদের মতে, মানুষের প্রাথমিক সামাজিক সংগঠনের রূপ ছিল যৌথ এবং সাম্যবাদী। বাংলা কবিতায় সাম্যবাদী চেতনার সৃষ্টিশীলতা কেবল নিজ বাসভূমেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং পৃথিবীটাকেই করেছে সে তার উত্তরাধিকার, যেখানেই দেখা গিয়েছে মানুষের অধিকারের লুণ্ঠন সেখানেই ওঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। সৃষ্টিশীলতার বাঁধ ভেঙে উচ্চারিত হয়েছে প্রতিবাদী বিদ্রোহের জয়ঢাক। একজন কবি সাম্যবাদী চেতনা ধারা উজ্জীবিত হবেন, এটা তাঁর সামাজিক অবস্থানগত কারণেই অনেকটা হতে দেখা যায় এবং অনেক কবি হয়েছেনও তাই। যদিও আমাদের দীর্ঘকালীন বাঙালি সমাজ ব্যবস্থার সাথে থিওরিটিক্যাল সাম্যবাদের পরিচয় থাকার কথা না। তবে সমাজ ও মানুষের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা আমাদের কবিদের কবিতায় নিয়তই ওঠে আসে। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কাব্য চর্যাপদ থেকেই আমদের কবিরা সাম্যবাদী অথবা সমাজসচেতন। তা আমাদের প্রাচীন জীবনবোধ, আর এই জীবনবোধই হলো আধুনিক থিওরিক্যাল সাম্যবাদ। বলা যায় সমাজচেতনা থেকেই আমরা সাম্যবাদে মিলিয়ে নিচ্ছি। চর্যাপদে আমরা দেখি নিম্নবর্গের নারীর কাছে রাতের বেলা ব্রাহ্মণ দেহজ কামনা বাসনা মেটাতে যায় এবং দিনের বেলা বর্ণভেদের আভিজাত্য দেখায়-

নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছই ছোই যাইসি বাহ্ম নাড়িআ ।।
আলো ডোম্বী তোএ সম করিবে' ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ।। (মজুমদার, ১৯৩৬)

তত্ত্বীয়ভাবে আমরা যাকে সাম্যবাদ বলছি তা আমাদের সাহিত্যে আমাদেরই নিজস্ব ঘরনার। আমাদের সাম্যবাদী অথবা সাম্যবাদী চেতনায় অনুপ্রাণিত কবিগণ হলেন- সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯–১৯৭৫), আবদুল গনি হাজারী (১৯২১–১৯৭৬), মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী (১৯২৭–২০০৭), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২–২০০৬), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২–১৯৮৩), বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬–২০২০), আল মাহমুদ (১৯৩৬–২০০৯), আহমদ ছফা (১৯৪৩–২০০১), নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫–), ফরহাদ মযহার (১৯৪৭–), হুমায়ূন কবির (১৯৪৮–১৯৭২), মুহম্মদ নূরুল হুদা (১৯৪৯–), খান মোহাম্মদ ফারাবী (১৯৫২-১৯৭৪) প্রমুখ। এসব কবিগণ মূলত স্বদেশের সামগ্রিক মুক্তিসংগ্রামে সাম্যবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় উজ্জীবিত। পঞ্চাশের এইসব কবির সামনে বিশ, তিরিশ ও চল্লিশের সাম্যবাদী বিশাল কবিগোষ্ঠী অনুপ্রেরণার জায়গারূপে কাজ করেছে। এছাড়া বিশ্বসাহিত্যে বিভিন্ন ভাষার সাম্যবাদী কবি ও কবিতা

এদের মন ও মননে ছায়া ফেলেছে। বিশের দশক থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত বাংলা কবিতায় সাম্যবাদী চেতনার একটি ধারা ক্রমেই প্রবল থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এই সময়পর্বে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬) ও বিষ্ণু দে (১৯০৯–১৯৮২) কাব্যচর্চায় সাম্যচেতনার স্বতন্ত্র স্বাক্ষর রেখেছেন। মূলত কাজী নজরুলের হাত দিয়েই আধুনিক বাংলা কাব্যে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী দর্শনের যাত্রাপথ সূচিত হয়েছে। তিরিশি পঞ্চকবির জীবনানন্দ দাশ(১৮৯৯-১৯৫৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) মধ্যে মার্কসীয় সাম্যবাদের অন্যতম রূপকার ছিলেন কবি বিষ্ণু দে। কাজী নজরুল ইসলামের কমিউনিস্টপ্রীতি থাকলেও তিনি যেমন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ কখনো গ্রহণ করেননি, তেমনি বিষ্ণু দে মার্কসবাদী কবি হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করলেও তিনি দলীয় কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন না। নজরুলের কবিতায় সাম্যবাদ এসেছে মূলত পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির এষণায় এবং স্বদেশপ্রেম হিসেবে। কাজী নজরুল ইসলাম মার্কসীয় সাম্যবাদের উপর ভিত্তি করে লেখছেন এমন ভাবনার অবকাশ নেই। তিনি লিখেছেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার উপর ভিত্তি করে পরাধীনতা ও ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসন থেকে মুক্তির প্রত্যাশায়। নজরুলের অন্তরালে প্রবহমান এক পরাভূত জাতিসত্তার জাগরণ প্রয়াস। পাশাপাশি তাঁর মানস সংবেদে প্রতিষ্ঠা পায় জগতের সকল নিপীড়িত মানুষের প্রতি প্রেমবোধে তাড়িত এক ঐকান্তিক মানবতাবাদ। এক্ষেত্রে কবি নজরুল ইসলামকে কোনো তাত্ত্বিক বিশ্বের দ্বারস্থ হতে হয়নি, কিংবা আয়াসলভ্য পাণ্ডিত্যের; বরং জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তিনি অর্জন করে নেন মানব মুক্তির পথরেখা-

গাহি সাম্যের গান-
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু মুসলিম ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান! (ইসলাম, ১৯২৫)

আবার সাম্যবাদ আল মাহমুদের কবিতায় এসেছে মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, বরং মানুষ ও মানবিকতাকে পরিচর্যা করার জন্য। ষাটের দশকে শামসুর রহমান, আল মাহমুদ, হাসান হাফিজুর রহমান ও আলাউদ্দিন আল আজাদ সমমাত্রিক গতিতে এগুলেও আল মাহমুদের কবিতার গতিপথ স্বকীয়তায় অনন্য। 'সোনালী কাবিন' যেন, প্রগতির সোনালি ইশতেহার। খুব সম্ভবত বাংলা কবিতায় সাম্যবাদের কথা 'সোনালী কাবিন' এ আল মাহমুদ যেভাবে বলেছেন, সে রকম সাহস ও বিচক্ষণতার সঙ্গে অন্য কেউ বলতে পারেননি। সাম্যবাদের সৌন্দর্য দেখিয়ে আল মাহমুদ শ্রমজীবী মানুষের বুকে এঁটে দিয়েছেন বীরের তকমা, এমন সাহসী উচ্চারণ আর ক'জন কবিই-বা করতে পারে-

শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতের উঠিয়াছে হাত
হিয়েনসাঙের দেশে শান্তি নামে দেখো প্রিয়তমা,
এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত
তাদের পোশাকে এসো এঁটে দিই বীরের তকোমা। (মাহমুদ, ১৯৭৩,)

সাম্যবাদে আস্থা ও প্রত্যয় আল মাহমুদের কবিতায় একটা বড় জায়গা জুড়ে বিরাজমান। তবে স্পষ্ট দুটি পর্বে সেটা প্রবাহিত (এক) মার্কসীয় সাম্যবাদ, (দুই) ইসলামের সাম্যবাদী চেতনা। সমগ্র কাব্যজগতের দিকে দৃষ্টি দিলে এটা লক্ষণীয় যে, স্বদেশের ও বিশ্বের অধিকার বঞ্চিত জনগণের জন্য শ্রেণি–বৈষম্যহীন সাম্যের বা সুষম বন্টনব্যবস্থার একটি সমাজ বিনির্মাণ কবির একান্ত কাম্য। এই লক্ষ্য ও চেতনাপ্রবাহ কাব্যে প্রকাশ করে বাংলাদেশের কবিতায় আল মাহমুদ সাম্যবাদী ভাবাদর্শের একজন শক্তিমান কবিরূপে চিহ্নিত-

আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বন্টন,
পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ,
এমন প্রেমের বাক্য সাহসিনী করো উচ্চারণ
যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ। (মাহমুদ, ১৯৭৩)

সামাজিক দায়বদ্ধ মানুষ হিসেবে কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর সমকাল ও সমাজকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। খুব সম্ভবত কাজী নজরুল ইসলামের মতো গুণের কবিতার সাম্যবাদও তাঁর সমাজের যাবতীয় অনিয়ম ও গ্লানি থেকেই এসেছে। তাঁর সমকাল ও সমাজকে তিনি তীক্ষ্ণভাবে বুনেছেন কবিতায়। কাব্যচর্চার প্রারম্ভিক দিকে গুণ জন্মভূমি নেত্রকোনা থেকে নিজের সম্পাদনায় 'সূর্যফসল' (নির্মলেন্দু গুণ, ১৯৯৫, পৃ. ৩৪) নামক একটি কবিতা সংকলন বের করেন। নেত্রকোনা স্টেশন রোডস্থ নূর প্রেস থেকে প্রকাশিত সংকলনটি মূলত স্থানীয় কবিদের। সংকলনটি বের হওয়ার পরে গোয়েন্দা বিভাগের কুনজর এড়ানোর জন্য সংকলনটি লুকিয়ে ফেলতে হয়। সংকলনটি বের হওয়ার পর গুণের নামে মামলা রজু হয় এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। উল্লেখ্য এই সংকলন থেকেই প্রতীয়মান যে গুণ মূলত স্বদেশকামী ও সমাজবাদী। উক্ত সংকলনে গুণের তিনটি কবিতা স্থান পেয়েছিলো, তাঁর একটি কবিতা উদ্ধৃত করে আমরা কবির তরুণ বয়সের তেজদীপ্ত সাম্যবাদী চেতনার রূপ দেখতে পাই-

তারপর সব শ্রমিকের মাঝে
একবার যেন আসি
সর্বহারার মুক্তির দিনে
একবার যেন হাসি। (গুণ, ১৯৯৫)

সাম্যভিত্তিক সমাজ বিনির্মানের দৃঢ় দীপ্তি নিয়ে এগিয়েছে গুণের কবিতা। ফলে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাঁর কবিতার গুরুত্বপূর্ণ দাবী, এখানে আমরা গুণকে সাম্যবাদী বলতে পারি। উল্লেখ্য ‘প্লেটো তাঁর আদর্শ রাজ্যে শ্রমবিভাগ ও শ্রেণিবিভাজনের দাবী করেছেন কিন্তু মার্কসবাদী সমালোচকরা প্লেটোর এই মনোভঙ্গিকে ফ্যাসিস্ট বলে চিহ্নিত করেছেন’(চৌধুরী, ১৯৭৫)। মার্কসবাদীদের মনোভঙ্গি বিধৃত হলো-‘মানুষের সুপ্ত চেতনাগুলোর জাগরণকে তিনি ভয় করেন, কেননা সে জাগরণ তাঁর বাঞ্ছিত শ্রেণিশৃঙ্খলিত সমাজব্যবস্থা ভেঙে ফেলবে’ (গুণ, ১৯৯৫)। আমরা বলতে পারি, এই সমতার দাবী পৃথিবীর মানুষের বহু প্রাচীন দাবী-

> সাম্য শব্দের আভিধানিক অর্থ সমতা বা সমান অবস্থান। ব্যাপক অর্থে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমানাধিকারের নিয়মকে সাম্য বলে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) তাঁর ‘সাম্য’ প্রবন্ধে বলেছেন-‘মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট-ইহাই সাম্য নীতি’। (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১)

পৃথিবীতে সকল সম্পদের উপর মানুষের সমান অধিকার থাকবে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের প্রারম্ভে সাম্যবাদী ধারার রাজনীতি মতাদর্শী হলেও নির্মলেন্দু গুণের কবিতার অবস্থান বিচার করলে বলা সঙ্গত যে তিনি সমকালকে ধারণ করে সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছেন। বিদ্রোহ, প্রেম ও মানবিক সম্পর্ক একসঙ্গে মিলিয়ে তিনি যে কবিতা নির্মাণ করেন তা আমাদের জীবনের জীবনবোধ। মানুষ, মানবিকতা, প্রেম-দ্রোহ, দেশাত্মবোধ আমাদের মানব সমাজের অংশ এবং এগুলো নির্মলেন্দু গুণের কবিতার প্রধান উপজীব্য। ব্যক্তিগত জীবনে সাম্যবাদী চেতনায় বিশ্বাসী গুণের কবিতায় থিওরিটিক্যাল সাম্যবাদের পাশাপাশি আমাদের বাঙালি সমাজের নানা শ্রেণি সংকট ও বৈষম্য ওঠে এসেছে। সাম্যবাদ আধুনিক যুগের একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক আদর্শে সাম্যবাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রয়োগ ও ব্যবহার যে সাফল্য এনে দিয়েছে, তা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বব্যাপী বিশ শতকীয় মার্কসবাদের উত্থান বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছে বিবিধ ব্যঞ্জনা। মার্কসবাদে প্রভাবিত বাঙালি কবি-লেখকদের রচনায় চেতনে-অবচেতনে প্রকাশিত হয়েছে মার্কসীয় সাম্যবাদ। সাম্যবাদ বৈশ্বিক ধারণা কিন্তু আমাদের বঙ্গজনপদে অসচেতনভাবে হলেও তার প্রয়োগ লক্ষণীয়। সাম্যবাদের বৈশ্বিক রূপ সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতি বিধৃত হলো-

> ১৮৪৮ সালে মার্কস এঙ্গেলস কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার প্রকাশ, ১৯১৭ সালে সংগঠিত রুশ বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে সাম্যবাদ বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী, প্রবঞ্চিত মানুষের আকাঙ্ক্ষিত জীবনদর্শন হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং শিল্প বিপ্লবোত্তর শ্রেণী বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে ১৯১৭ সালে সংগঠিত রুশ বিপ্লব।

> ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। রুশ বিপ্লবের সঞ্চায়িত চেতনাস্রোতের ভারতীয় উপমহাদেশেও লেগেছিল। (আহমেদ, ২০০৭)

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদের বড় ধরনের প্রভাব ছিল ব্রিটিশ আমলের শেষদিক থেকেই। ত্রিশের কবিদের পাশাপাশি নজরুল-সুকান্তের ব্যাপক জনপ্রিয়তার পেছনে এটিও ছিল অন্যতম কারণ। বাংলাদেশের সাহিত্যের ওপর পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যেরও একটা কঠিন প্রভাব ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাম রাজনীতির জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশের কবিগণের বিরাট একটি অংশ বাম রাজনীতির অনুরাগী ছিলেন। সেই সময়ে রচিত নির্মলেন্দু গুণের একটি সুপরিচিত কাব্যে নাম 'তার আগে চাই সমাজতন্ত্র'। তখন দেশের যুবসমাজ, তরুণসমাজ বিশেষত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মেধাবী শিক্ষার্থীগণ দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে ছিলো বিভোর এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও সমাজতন্ত্র ঘেঁষা ছিল। আমাদের সংবিধানের চারটি মূলনীতির একটি ছিল সমাজতন্ত্র। স্বভাবতই নির্মলেন্দু গুণের সমাজতন্ত্রমুখী কবিতাগুলো ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গসহ পৃথিবীর নানা প্রান্তেও বামপন্থী ভাবনার কবিতার জোয়ার ছিল তখন। কিন্তু কালক্রমে বাম রাজনীতি মুখ থুবড়ে পড়তে থাকলে কবিদের বড় একটি অংশ ডান ঘেঁষা হতে থাকেন। কবি নির্মলেন্দু গুণ রুশ কবি মিখাইল লুকোনিন ধারা প্রভাবিত ছিলেন । উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালে গুণ যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার সীমানন্তে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং মস্কো রাইটার্স ইউনিয়নের কর্মকর্তা লেখিকা কমরেড মরিয়ম সালগানিকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়ে উৎফুল্ল হয়েছিলেন। তাঁর আত্মজৈবনিক 'আমার কণ্ঠস্বর' গ্রন্থে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সোভিয়েট কবি মিখাইল লুকোনিন কর্তৃক প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি উদ্ধৃত হলো-

> আমার মধ্যে সোভিয়েত-প্রীতি এবং সমাজবাস্তবতাবাদী মার্কসীয় সাহিত্যদর্শনের প্রতি আস্থা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সোভিয়েট কবি মিখাইল লুকোনিন আমাকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছিলেন বলে আমার ধারণা। (গুণ, ১৯৯৫)

রুশ বিপ্লবের চেতনাস্রোত কবি নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় কতটুকু লেগেছে তা আমাদের বিবেচ্য বিষয় না। তবে গুণের কবিতা পৃথিবীর মানুষকে এক বিন্দুতে সমন্বয় করতে চায়। যাপিত জীবনে গুণ সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির সামিল মনে করেন এবং নিজেকে লোক কবির অন্তর্ভূক্ত মনে করেন । ১৯৮৩ সালে কাকলী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'নির্বাচিতা' কবিতার প্রথম সংস্করণের ভূমিকা অংশে গুণ নিজের কবিতার সংগ্রামী আত্মার হৃৎস্পন্দনচিত্র তুলে ধরেন এভাবে-

> আমার জীবনের প্রথম ষোল বছর একটানা কেটেছে গ্রামের আউল-বাউল আর চাষাভুষাদের মাঝে। খুব ছোটোবেলা থেকেই তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার স্পর্শ পেয়েছি আমি। সেখানেই আমার কবিসত্তার জন্ম হয়েছে। আমি অনুভব

করেছি, আমাদের আপাতনির্দোষ সমাজব্যবস্থার গভীরে একটা বড় রকমের ব্যাধি আছে লুকানো। আমি আহত হয়েছি এই সমাজের দিকে তাকিয়ে। (গুণ, ২০১১)

আশির দশকের শেষদিকে পৃথিবীব্যাপী সমাজতন্ত্রের পতনে কবি দ্বিধাগ্রস্ত হলেও হতাশ হননি। কারণ, তিনি 'দর্শন বা তত্ত্বের চেয়ে তাঁর সমাজের মানুষের উপর বেশি আস্থাশীল মানুষের মুক্তির জন্যই দর্শন থেকে দর্শনান্তরে, তত্ত্ব থেকে তত্ত্বান্তরে কবির পথপরিক্রমা। কবিতার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে অথবা কবিতায় সমাজ ও মানুষকে চিত্রায়ণ করতে গিয়ে রাজনৈতিক কবি হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়েছেন-

আমার আত্মার আনন্দের সঙ্গে উপলব্ধি ও আর্তির সঙ্গে একাকার হয়ে মিশেছে বলেই আমি যখন শ্রমিক-কৃষকের কথা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা বলি, তখন কেউ-কেউ ভুল করে ভাবেন---, আমি বুঝি কবিতা বাদ দিয়ে রাজনীতি করছি। প্রকৃতপক্ষে মোটেও তা নয় (গুণ, ২০১১)।

নির্মলেন্দু গুণ এক ধরনের সহজিয়া আবেগে প্রেম ও বিপ্লবের সমান্তরাল অনুভূতিকে কবিতার শরীরে স্থাপন করেন। একদিকে তিনি প্রেমিক, রমণপ্রিয়, আত্মকেন্দ্রিক, নারীর নিবিড় সান্নিধ্যের প্রতি আগ্রহী। অন্যদিকে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর ধারণাও অনেকের চাইতে অগ্রসর। প্রিয় রমণীকে সাজানোর আগে একটি সাম্যের সমাজ বিনির্মাণে মনোযোগী এই বিশুদ্ধ প্রেমের পরিশুদ্ধ কবি। 'তার আগে চাই সমাজতন্ত্র' কবিতায় কবির আকুতি উদ্ধৃত হলো-

একদিন নিশ্চয়ই আমাদের পৃথিবী আর এরকম থাকবে না,

একদিন নিশ্চয়ই অনেক মানুষের স্বপ্ন এসে একটি বিন্দুতে মিলবে। (গুণ, ১৯৮৯)

কিন্তু প্রেম ও রমণীর সান্নিধ্য-আকাঙ্ক্ষার ফলে এই সামাজিক-রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে তিনি নিজেকে আড়াল করতে চাইছেন না। কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' (১৯৭০)-এর 'হুলিয়া', 'অসমাপ্ত কবিতাসহ কয়েকটি কবিতা বিশ্লেষণ করলে তাঁর অঙ্গীকারের বিস্তৃত পরিধির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। স্বীকারোক্তিমূলক হুলিয়া কবিতার মধ্য দিয়ে নির্মলেন্দু গুণ সমাজ ও সময়ের দায়বদ্ধ কবি স্বভাবকেই মূলত উন্মোচন করলেন। নির্মলেন্দু গুণের কবিতার অবস্থান বিচার করলে বলা সঙ্গত যে তিনি সমকালকে ধারণ করেছিলেন যথাযথভাবে। বিদ্রোহ, প্রেম ও মানবিক সম্পর্ক একসঙ্গে মিলিয়ে তিনি যে কবিতা নির্মাণ করেন তা আমাদের জীবনের জীবনবোধ। মানুষ, মানবিকতা, প্রেম-দ্রোহ, দেশাত্মবোধ নির্মলেন্দু গুণের কবিতার প্রধান উপজীব্য-

চারপাশে দুঃখী, দরিদ্র ও সংগ্রামী মানুষের কাছ থেকেই আমি সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। পরে জেনেছি, আমার ওই রকমের চিন্তাভাবনা মাক্‌সবাদী

চিন্তার কাছাকাছি। সঠিক দিনক্ষণ হিসাব করে বলা কঠিন হবে- কবে, কীভাবে আমি মার্কসবাদে আস্থাশীল হয়েছিলাম। (গৈরিক, ২০২০)

দেশপ্রেমিক মা, মাটি, মাতৃভূমিকে ভালোবাসেন নিজের চেয়েও বেশি। নির্মলেন্দু গুণ দেশপ্রেমের যে-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা সত্যিই বিরল। ১৯৬৬ এর ছয় দফা আন্দোলনের সঙ্গে আত্মিকভাবে জড়িত ছিলেন তিনি; এরপর বাদ পড়েনি স্বাধীনতার পূর্বের ও পরের কোনো বিপর্যয়, যত বার এ রাষ্ট্র বিপথগামী হয়েছে-কলম ধরেছেন তিনি, লিখেছেন একের পর এক শ্রেণিসংগ্রাম এবং স্বৈরাচার-বিরোধী কবিতা। তাঁর প্রকাশিত কাব্য সংখ্যা প্রায় শতাধিক; তার মধ্যে অন্যতম 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' (১৯৭০), 'কবিতা, অমীমাংসিত রমণী' (১৯৭৫), 'দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী' (১৯৭৪), 'বাংলার মাটি বাংলার জল' (১৯৭৮), 'তার আগে চাই সমাজতন্ত্র' (১৯৭৯), 'দূর হ দুঃশাসন' (১৯৮৩), 'চিরকালের বাঁশি' (১৯৮৬), 'দুঃখ করো না, বাঁচো' (১৯৮৭), 'আনন্দ উদ্যান' (১৯৯৫), 'পঞ্চাশ সহস্র বর্ষ' (১৯৯৫), 'প্রিয় নারী হারানো কবিতা' (১৯৯৬) ইত্যাদি। প্রতিটি কাব্যে স্বদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি পরম মমত্ববোধের পরিচায়ক-

সবাই যারে পথের ধারে গেছে দু'পায়ে দলে
তুমি কি চাও নাম কুড়াতে তাঁদের কথা বলে?
তাঁদের সেই ঘাম জড়ানো নাম কুড়াতে হলে
পুড়তে হবে মাঠের রোদে, ভিজতে হবে জলে। (গুণ, ২০১৩)

নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় দেশের পলিমাটির ঘ্রাণ, সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, সংগ্রাম থেকে শুরু করে নিম্ন–মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তের চিন্তাধারার রূপান্তর কবিতার অন্তপ্রাণ। নেকাব্বর, রেখা কিংবা অসমাপ্ত কবিতা'য় ঘুরে ফিরে তিনি বাঙালি সাম্যবাদী প্রতিনিধি কবি হিসেবে এসেছে বাংলায়। একই সঙ্গে পরিণত ও তরুণের হৃদয়ানুভূতি তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে যায়। সময় নির্মলেন্দু গুণের কবিতার অবস্থান বিচার করবে। এ মুহূর্তে শুধু বলা সঙ্গত, তিনি আমাদের সমাজের সমকালকে ধারণ করেছিলেন যথাযথভাবে। বিদ্রোহ, প্রেম ও মানবিক সম্পর্ক একসঙ্গে মিলিয়ে তিনি যে কবিতা নির্মাণ করেন তা আমাদের জীবনের গল্প। মানুষ, মানবিকতা, প্রেম-দ্রোহ, দেশাত্মবোধ নির্মলেন্দু গুণের কবিতার প্রধান উপজীব্য-

যতোক্ষণ তুমি কৃষকের পাশে আছো
যতোক্ষণ তুমি শ্রমিকের পাশে আছো
আমি আছি তোমার পাশেই। (গুণ, ১৯৮৯)

নির্মলেন্দু গুণ সার্বক্ষণিক মানব মুক্তি ও মানব সমাজের কবি। দীর্ঘ কাব্যচর্চায় যেকোন বিষয়কে তিনি স্বদেশের মায়ায় জড়িয়ে তাঁর কবিতার শরীরে বিস্তার করে দিয়েছেন নান্দনিক সৌকর্যে। স্বদেশকামী গুণের কবিতার বিষয় হয়ে ওঠেছে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ থেকে শুরু করে সাধু সন্ন্যাসী, আউলিয়া, দরবেশ, ফকির, মিসকিন, শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষ থেকে লেলিন পর্যন্ত। নিজের ভৌগোলিক সীমারেখায় তিনি কবিতার শিখা হাতে মানুষের কথায় বলে গেছেন গভীর মায়ায়। তাঁর 'স্বপ্ন, নব-ভৌগোলিক শিখা' কবিতা থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি-'আমি স্বদেশের মায়ায় জড়ানো কবি (নির্মলেন্দু গুণ ২০১১, পৃ. ১৪৬) । নির্মলেন্দু গুণ সম্ভবত বর্তমানে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি। তাঁর এই জনপ্রিয়তা হঠাৎ পাওয়া কোনো ধন নয়। কবি জীবনের গোড়াতেই তিনি পাঠক সম্প্রদায়ের নজর কেড়েছিলেন সত্য, কিন্তু তখনও তিনি অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি। সেই সময়ে তাঁর কবিতার পঙক্তিমালা কবিতাপ্রেমিকদের মুখে মুখে ঘুরতো না, তাঁর বই প্রকাশের জন্যে প্রকাশকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতো না। জনপ্রিয়তার চূড়া স্পর্শ করার জন্যে তাঁকে কবিতার রক্তপিপাসু পথে হাঁটতে হয়েছে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে। বাঙালি ও বাংলাদেশের যেকোন সংকটে তাঁর কবিতা রুখে দাড়িঁয়েছে। সমাজের সকল স্তরে অসাম্য দূর করে সমতার সমাজ বির্নিমান গুণের কবিতা বজ্রমুটি হয়ে কোটি মানুষের জয়ধ্বনিতে পরিণত হয়। সমাজের সকল অনিয়মের বিপক্ষে তাঁর কবিতা অভয়মন্ত্র-

-সামনে কী?

: আগামীকাল।

-মনে কী?

: অভয়মন্ত্র।

-লক্ষ্য কী?

: সমাজতন্ত্র। (গুণ, ১৯৮৯)

নির্মলেন্দু গুণের কাব্যের নামকরণ থেকে পাঠক চিত্তে তাঁর কাব্য প্রকৃতি সর্ম্পকে ধারণা মেলে। রাষ্ট্রীয় দুঃশাসনের কালে যেমন তাঁর কাব্যের নাম হয় 'দূর হ দুঃশাসন'(১৯৮৩)। আবার সুশীতল শ্যামল গ্রাম বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যে বিমোহিত কবির কাব্যের নাম হয়ে ওঠে 'বাংলার মাটি বাংলার জল'(১৯৭৮)। সাম্যবাদী চেতনায় বিশ্বাসী গুণের কবিতার অন্তরাত্মা জুড়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর স্বপ্ন, তখন তাঁর কাব্যের নাম হয়ে ওঠে ' তার আগে চাই সমাজতন্ত্র' (১৯৭৯)। গুণ কবিতায় সর্বৈব একজন সাম্যবাদী মানুষ হিসেবে 'চাষাভুষার কাব্য'(১৯৮১) চর্চায় মনোযোগী থাকেন, উক্ত কাব্য থেকে উদ্ধৃত করা হলো-

চাষাভূষার জন্যে তুমি লিখতে আমায় কহ যে

চাষাভূষার কাব্য লেখা যায় কি এতো সহজে?

সবাই যারে পথের ধারে গেছে দু'পায়ে দলে

তুমি কি চাও নাম কুড়াতে তাঁদের কথা বলে? (গুণ, ১৯৮৯)

গুণের সামগ্রিক জীবন পর্যালোচনায় তাঁকে আপাদমস্তক একজন নিষ্কণ্ঠক সাম্যবাদী ও মানবিক মানুষ হিসেবে দেখতে পাবো। জন্মভূমি নেত্রকোনার শৈশব কৈশোর, বারহাট্টা করোনেশন কৃষ্ণপ্রসাদ ইনস্টিটিউশন থেকে মেট্রিক অথবা ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ জীবনে আমরা একজন দেশ ও সমাজ প্রেমী গুণকে দেখবো। তাঁর আত্মজীবনী 'মহাজীবনের কাব্য' (২০১৩) গ্রন্থে ১৯৪৫-১৯৭৫ পর্যন্ত বাঙালি জীবনের সবচেয়ে ঘটনাবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কবির মানবিক অস্তিত্বের বহুমাত্রিক প্রকাশ পাঠক দেখতে পাই। গুণ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি সত্যসন্ধানী ও স্বীকারোক্তিমূলক ধারার কবি। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ যেমন সত্য তেমনি তিনি একজন সর্বৈব কবি তাও সত্য, এই সত্যটুকু তাঁর আত্মজীবনী থেকে উদ্ধৃত হলো-

> সামাজিক আমির পাশাপাশি, ... আমি কবি, কবি এবং কবি। আমি বিশ্বাস করেছি, প্রকৃতির কোনো দুর্জ্ঞেয়-রহস্যের কারণেই, এই বঙ্গদেশে আমার কবিজন্ম সাধিত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করেছি, এই সমাজে, এই সময়ে আমার মতো একজন নীলকণ্ঠ কবির প্রয়োজন ছিলো। ... আমাকে জানবার পাশাপাশি তারা লক্ষপ্রাণের মূল্যে মুক্ত আমাদের দেশটিকে জানবেন, ষাট ও সত্তর দশকের উত্তাল- সময়ের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে জানবেন। (গুণ, ২০১৩)

স্বাধীনতার পূর্বে তিনি সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। পরর্বতীতে তিনি শুধুই কবি, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক কবি। নির্মলেন্দু গুণের কবিতা মূলত তাঁর যাপিত জীবন, আকাঙ্ক্ষা ও চেনা-পৃথিবীর নান্দনিক বুনন, যেখানে সমকাল ও সমাজের প্রতি নিজেকে রেখেছেন নিষ্ঠাবান। ফলে তার কবিতার প্রতীক ও অলঙ্কারে আকীর্ণ না হওয়ায় অতি সহজেই কাব্য পাঠককে আকৃষ্ট করে থাকে। তিনি ষাটের দশকের কবিতা রচনা করেন এবং পরের দশকেই তরুণদের নিকট ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন সত্তরের দশক থেকে তার জনপ্রিয়তা এখনো কমেনি। বাংলাদেশে, বাংলা ভাষা ও বাঙালির প্রতি তিনি থেকেছেন পরম দরদী। তাঁর দীর্ঘ বোহেমিয়ান কবিতা জীবনে আমরা মা, মাটি ও মানুষ থেকে কখনো তাঁকে বিচ্ছিন্ন থাকতে দেখিনি। গুণের 'আমার কণ্ঠস্বর'(১৯৯৫) নামক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ থেকে তাঁর মানবিক ও সাম্যবাদী চেতনার কমিটমেন্ট উদ্ধৃত হলো-

> কত মানুষ ফুটপাতে সংসার গড়ে তোলে। সেখানে তারা খায়-দায়, এমনকি সন্তানেরও জন্ম দেয়। আকাশের তারা গুনতে গুনতে খোলা আকাশের নিচে তারা ঘুমিয়ে পড়ে। তারা যদি পারে, তো আমরা পারবো না কেন? রাত কাটানোর ব্যাপারে অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা কাটানোর উপায় সন্ধান করতে গিয়ে একদিন আমি ফুটপাতের বাসিন্দাদের দিকে ভালো করে তাকাই। ভাবি, মন্দ কি? নিত্যনব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হোক জীবন। প্রতিভা অনেকেরই থাকে, অভিজ্ঞতাই প্রতিভাবানদের জীবনকে পৃথক করে। (গুণ, ১৯৯৫)

আশির দশকের শেষদিকে পৃথিবীব্যাপী সমাজতন্ত্রের পতনে কবি দ্বিধাগ্রস্ত হলেও হতাশ হননি। কারণ, তিনি 'দর্শন বা তত্ত্বের চেয়ে মানুষের উপর বেশি আস্থাশীল মানুষের মুক্তির জন্যই দর্শন থেকে দর্শনান্তরে, তত্ত্ব থেকে তত্ত্বান্তরে কবির পথপরিক্রমা। ছাঁচে-ঢালা সংগ্রাম ও দ্রোহের পূর্বপরিচিত সেই পথের সঙ্গে হয়তো মিল থাকবে না, তাই বলে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে আর কখনও মার্কস-লেনিনের দর্শন বা ঐ দর্শননির্ভর সাহিত্যের কাছে ফিরে যাবে না- এমন কথাই বা বলা যায় না। গুণের কাছে কবিতা হচ্ছে কবির মনে রেখাপাত করা আপাতবিশ্বাসের শব্দবদ্ধ বাণীরূপ। বিশ্বাস ও সময়ের অমোচনীয় হৃদ্‌স্পন্দন। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, তিনি তত্ত্ব বা দর্শনের দাস হতে চান না, মানুষের মুক্তিই তাঁর মূল লক্ষ্য, প্রতিবাদ ও সংগ্রাম তাঁর হাতিয়ার। প্রয়োজনে তিনি তত্ত্ব বা দর্শনের বিষয়ে আপস বা সমন্বয় করতেও প্রস্তুত। ফলে গুণের কবিতার চৌহদ্দি হয়ে ওঠে সারা পৃথিবী ও পৃথিবীর মানুষ–

> যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, শুধুমাত্র সেই দেশের চৌহদ্দির মধ্যেই কবি আবদ্ধ থাকেন না- পৃথিবী নামক এই সম্পূর্ণ গ্রহটিই কবির দেশ, লোক থেকে লোকান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে কবির মন তাই ছুটে বেড়ায়। যেখানে সুন্দরের সন্ধান মেলে সেখানেই কবির মন আনন্দ পায়, পৃথিবীর যে-কোনো দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্টেই তাঁর মন ব্যথিত হয়। লুকোনিনের 'দগ্ধ সীমান্ত' কবিতার মধ্যে কবির সেই উদার আন্তর্জাতিকতাবাদী মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়ে আমার কাব্য জীবনের শুরুতে আমি খুবই উপকৃত বোধ করি। (গুণ, ১৯৯৫)

শুধুই যে নিজ দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাকে ব্যথিত করছে এমন না, যেখানে দেখেছেন মানবিক বিপর্যয় সেখানেই তাঁর কবিতা অবস্থান মানব মুক্তির পক্ষে। তাঁর দীর্ঘ কাব্যিক যাত্রায় তিনি বিশ্ব মানবতার পক্ষে কবিতার শাণে মানবতার সুর তুলেছেন। কবিতাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন তাঁর সংগ্রামী আত্মার হৃৎস্পন্দনচিত্র বলে। এই সংগ্রামের প্রবণতা ও অভিমুখকেও তিনি শনাক্ত করেছেন তাঁর আত্মার আনন্দের সঙ্গে, উপলব্ধি ও আর্তির সঙ্গে একাকার করে। ফলে পৃথিবীর যেখানেই দেখেছেন বিপর্যয় সেখানেই তাঁর কবিতা সোচ্চার হয়ে ওঠে। 'আফ্রিকার প্রেমের কবিতা' শীর্ষক কবিতায় দেখবো আফ্রিকার মানব মুক্তির

গণতান্ত্রিক নেতা নেলসন মেন্ডালাকে গুণের শোকাতুর কবিতা বুকে আগলে রাখে। আবার আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরোধী কবি বেঞ্জামিন মোলোসির করুণ পরিণতিও তাঁর কবিতায় ওঠে আসে। বেঞ্জামিন মোলোসির বিচারের সময়, তার বিরুদ্ধে প্রমাণের বৈধতা, তার স্বীকারোক্তির সত্যতা এবং প্রক্রিয়াটির সামগ্রিক ন্যায্যতা সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছিল। রাষ্ট্রপতি পিডব্লিউ বোথার ক্ষমা বা পুনর্বিচারের প্রত্যাখ্যানের পর , মোলোইসকে ১৯৮৫ সালে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুদণ্ড জোহানেসবার্গে দাঙ্গা, বিশ্বের প্রধান শহরগুলোতে বিক্ষোভ এবং কূটনৈতিক নিন্দার ঝড় তুলেছিল। গুণের কবিতা বেঞ্জামিন মোলোসির অপূর্ণ স্বপ্ন বুকে নিয়ে জেগে আছে এশিয়ায়। আবার মুক্ত প্যালেস্টাইন প্রত্যাশী গুণ যুদ্ধ শেষে মুক্ত প্যালেস্টইনের জন্য প্রার্থনা জুড়ে দেন কবিতায়। প্যালেস্টাইন ভূমির নাগরিকদের জন্য তাঁর মর্মবেদনা বিধৃত হলো-

হয়ত আমার কবিতা
যুদ্ধ মৃত্যু আর অন্তহীন রক্তপাত শেষে
চেয়েছিল তোমাদের অনন্ত শান্তির সরোবরে
প্রেমিক পদ্মের সুগন্ধ ছড়িয়ে ফুটতে। (গুণ, ১৯৮৯)

আমরা আগেই বলেছি গুণের কবিতায় আছে স্বদেশের শ্রমিক-কৃষকের কথা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা। দুর্বলের প্রতি আচরিত অত্যাচার যখন ঘা দেয় কবির বুকে, গুণ তখন আমার নয় বলে তাড়িয়ে দেই না তাকে; আপনার বলে সে অনায়াসে গৃহীত হয় গুণের কাব্যসত্তার ভিতর-মহলে। এভাবেই কবির কবিচিত্ত অপরের নিত্যদিনের জীবন-সংগ্রামে যুক্ত হয়। নির্মলেন্দু গুণ কবিতার দৃশ্য আর বাস্তবতা তৈরি করেন চারপাশ থেকে। চারপাশে মানুষ যখন ঘোরতর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যায়, গুণ তখন আবশ্যিকভাবে আঁকেন সেই রূপান্তরের বাস্তবতা। আর এই রূপান্তর যদি হয় অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে স্বজাতির রূপান্তর, তখনই গুণের কবিচৈতন্য বলে ওঠে-

একটি মাত্র শস্যক্ষেত থাকবে, বাংলাদেশ।
আমাদের প্রিয় জন্মভূমি
আমরা চাষ করবো ট্রাক্টরে, লাঙলে, কোদালে,
ওলট-পালট করবো কালো মাটি,
সাড়ে সাত কোটি হাত নতুন শস্যের বীজ বুনবে। (গুণ, ১৯৮৯)

কবি নির্মলেন্দু গুণের প্রত্যাশা মাতৃভূমির যেকোন সংকট মোকাবেলা দেশের সর্বস্তরের জনগণ সামিল হবে, তামাটে জনতার সাথে আধুনিক শহুরে লিপিস্টিক পরা মেয়েরাও। আঠারো কোটি হাত বাংলা শস্যক্ষেতে ফসল ফলাবে। আমাদের রাজনৈতিক দুর্ভাগ্যের

পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্ভাগ্যও চিরায়ত। অধিকন্তু কৃত্রিম সংকটও আমাদের ভাগ্যের সাথে সামিল। ' কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে আলাপ' কবিতায় মানবিক কবির আপসোস-

গত দুর্ভিক্ষে না খেয়ে যারা মারা গেছে তাদের নিয়ে দুঃখ
না ফুরাতেই আসে আসন্ন দুর্ভিক্ষের জন্য
ঘরে ঘরে যারা প্রস্তুত হচ্ছে তাদের কথা। (গুণ, ১৯৮৯)

কবি নির্মলেন্দু গুণের চেতনায় সমাজতন্ত্র ও বির্বতিত সমাজ বিশ্বাস স্পষ্ট। তাঁর কাব্যে সেজন্য উগ্র ও প্রত্যক্ষ চিৎকার ধ্বনিত। সর্বাঙ্গীন কল্যাণকামনায় আধুনিক চিন্তনে তাঁর কবিভাষা দুর্বিনীত। সমাজতন্ত্রের জন্য আমূল চিৎকার, ব্রীড়াহীন, অনলংকার, সরাসরি প্রকাশভঙ্গি তাঁকে গ্রাস করে নিলো। যা ছিলো মেদুর, সজল ও কামতপ্ত তা হয়ে উঠল তীব্র, রুক্ষ ও ঝলসানো। এর মাঝামাঝি আবার স্বল্পকালীন বৈরাগ্য-ভাবিত আনন্দকুসুম চয়ন। তবে প্রথম থেকে শেষাবধি গুণ আশিরনখ রোমান্টিক-

> প্রেমের কবিতায় আবেগের বহুবর্ণিল সফেনতা, সমাজতন্ত্রের কবিতায় কল্পস্বর্গীয় পয়গম্বরিতা-সর্বত্রই তিনি বাউল, আজন্মঅস্থির, প্রদর্শনকামী, সংরক্ত, মর্ষবিলাসী, স্বমৈথুনানুরক্ত। নজরুলের সাথে তাঁর মিল আছে অনেকটা, যদিও চেহারায়, চলনবলনে রবীন্দ্রনাথেরই অনুকরণ করতে ভালোবাসেন গুণ। (খোন্দকার, ১৯৯৪)

যাই হোক, শব্দ ও ভাষার খেলায় কবিগণ আত্মনিয়োগ করেন। তবে সমষ্টিগত সামাজিক, দেশীয় ও বৈশ্বিক বিষয়াদি কবিতায় এড়াতে পারে না। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই চলে আসে কবিতায়। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষঙ্গগুলোর বাস্তব ক্রিয়া বিক্রিয়া খেলা করে কবির মানসজগতে। কবিকে করে আত্ম ও সত্যানুসন্ধানী। এর প্রভাব যখন পড়ে কবিতায় তখনই কবিতা হয়ে প্রাসঙ্গিক, কবিতা হয় কালোত্তীর্ণ। কবি নির্মলেন্দু গুণের কবিতা সমাজবিচ্ছিন্ন কখনোই ছিল না। এখনো তা থাকবে এমনটা কাম্য নয়। আমাদের বাঙালি সমাজের চিরায়ত জীবনবোধে গুণ সদায় জাগ্রত-

মানুষকে ক্ষুব্ধ করে ক্ষুধা, তাকে তৃপ্ত করে ভালোবাসা ।
তাই বলে দু'বেলা দু'মুঠো মোটাচালের ভাতেই আমার চলে,
একথা বলি না। যারা বলে, তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করে ।
আমি ভালোবাসি থালাভরা চিকনচালের ঝরঝরে শাদা ভাত। (গুণ, ২০১১)

নির্মলেন্দু গুণের কবিতার চেতনজগত নির্মিত হয়েছে জীবনবৈচিত্র্য গতি ও সংঘর্ষ, সংক্ষোভ ও যন্ত্রণা, শ্লাঘা ও বেদনা এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক যুদ্ধ, ঝড়ঝঞ্ঝার উত্তাল ঢেউ দিয়ে। তাঁর কবিতা ষাটের উত্তাল সময় থেকে শুরু করে আজকের বাংলাদেশ অঞ্চলের দিকে তাকালে আমরা সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারবো। এসব কবিতায়

ব্যক্তি বা সমষ্টিগতভাবে সমাজের মুক্তিকামী মানুষের দহন অগ্নিগোলায় প্রকাশিত হয়েছে। বলার অধিকার, ভাষার অধিকার, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে-

না আমি নির্মিত নই বাল্মীকির কাল্পনিক কুশে
আমাকে দিয়েছে জন্ম রক্তঝরা অমর একুশে। (গুণ, ২০১১)

সমাজসচেতন কবির কবিতায় সমকাল উঠে আসবে- এটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ইংরেজ হঠাও আন্দোলন, দেশ বিভাজন, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের অভ্যুত্থান এবং গণতন্ত্রের লড়াইসহ উপমহাদেশে বাঙালি জীবনের যে কোন সংকট গুণের লেখায় এসেছে। আর যখন সংকট আসে না তখন বুঝতে হবে কবিরা সময়কে ধারণ করছে না। কিংবা করলেও কোনো এক অদৃশ্য কারণে তারা লিখছে না। লিখলেও তা প্রকাশ করছে না। কিন্তু গুণ তাঁর সমাজ ও সমকালকে যেভাবে দেখছেন তা কবিতায় নির্ণয় করেছেন বলিষ্ঠ বুননে-

আমি তো তখন মৃত্যু, আলিঙ্গন তুচ্ছ মনে করে
ডিমের খোলস ভেঙে পাখির মতন
রাজপথে বেরিয়ে এসেছি ; যেখানে মানুষ তার
জীবনের সব প্রাপ্য এসেছে মেটাতে। (গুণ, ১৯৮৯)

গুণের সব কবিতাই সমকাল ও আমাদের সমাজের কবিতা হিসেবে আমলে নেওয়া যায়। মোদ্দাকথা সমকালীন সাহিত্য বা Contemporary Literature মানে সময়ের প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা, বর্তমান সময়ের ধ্বনি ও ভাষা, বর্তমানের সুর, তাল, লয় ও অনুভূতি, বাস্তবতায় মানুষের কাজ, চিন্তা, বোধ ও জীবন-যাপণের প্রতিফলন। আর এই প্রতিফলনই হয় সমাজচিত্র তথা সমাজমানুষ । গুণের অনেক কবিতায় এটাও মনে রাখতে হবে যে কালকে ছাড়িয়ে গেছে। এমন কবিতা পরবর্তীতেও মানুষের কাছে সমান আবেদন রাখতে পারে। বাংলা কাব্য-জগতে বৈচিত্র্যময়প্রতিভা নির্মলেন্দু গুণ জন্মগ্রহণ করেন-

> ময়মনসিংহ জেলার বারহাট্টা থানার কাশতলা গ্রামে। তারিখ ৭ই আষাঢ় ১৩৫২, ইংরেজী ২১শে জুন ১৯৪৫ সাল। পিতা সুখেন্দু প্রকাশ গুণ চৌধুরী, মাতা বীণাপানি। কবির বড় ভাইয়ের নাম পূর্ণেন্দু এবং বড় বোনের নাম রূপালী। তবে এই দু'জনের মাঝে একজন বড় ভাই ছিলেন, তার নাম ছিল কালিদাস। 'তিন বছর বয়সে কালিদাস ম্যালেরিয়ায় মারা যায়'। (রহমান, ১৯৯৬)

চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করে অনিয়মের আকর্ষণে কবিতাচর্চা শুরু করেছেন নির্মলেন্দু গুণ। কবিতার কাব্যকলা-ছন্দ-মান উপেক্ষা করে তিনি তাঁর দেখা জীবন ও জগৎ বিশেষ করে নাগরিক জীবনযন্ত্রণা, সমাজ ও সংসারের নানা অসঙ্গতি, সাধারণ মানুষের লাঞ্ছনা, নির্যাতন, বঞ্চনা ইত্যাদিকে করেছেন কবিতার উপাদান। নিজের কবিতা সম্পর্কে তিনি তাঁর কাব্যসমগ্র-এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন-'পীড়িত- আত্মার যন্ত্রণাকে আমি ভাষ্য দিতে চেয়েছি আমার কবিতায়' (নির্মলেন্দু গুণ ১৯৯৩,পৃ.ভূমিকা অংশ)। তবে বৌদ্ধিক পাঠের কিছু অভিযোগ গুণকে বহন করতে হচ্ছে, রাজনৈতিক কবি হওয়ার পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তি জীবনে ভণিতার আশ্রয়ও আছে। মোটাদাগে কবি বাচঁবেন কবিতা দিয়ে। কবিতার মানদণ্ডে কবি গুণের অবস্থান সময় নির্দিষ্ট করবে, পাঠকের হৃদয়গ্রাহী পাঠে। গুণের কঠিন সমালোচকও গুণের কবিতার প্রশংসা করতে দ্বিমত করবেন না। তিনি সহজাত স্বভাবের স্বদেশকামী কবি। সহজাত ও স্বভাবজাত কবি গুণ তাঁর কাব্যসত্তা নিয়ে অন্যত্র বলেছেন এভাবেই-

> আমার কর্ণকুহরে চারপাশের শব্দপুঞ্জ যে ছন্দে ধ্বনিত হয়েছে, আমার আবেগ আমার হৃদয়পিণ্ডের রক্তপ্রবাহের মধ্যে যে ছন্দে দোলা দিয়েছে, তাকেই আমি গ্রহণ করেছি আমার কবিতার সঙ্গে মানানো ছন্দ হিসেবে। কখনো তা প্রচলিত ছন্দের সঙ্গে মিলেছে, কখনো মেলেনি। কোনো ক্ষেত্রেই কোনো কলাকৈবল্যবাদী কাব্যবিশারদ বা বৈয়াকরণের ছাড়পত্র আমি প্রত্যাশা করিনি। আমি জানি আগে কবি, পরে এরা। (গুণ, ১৯৯৩)

ফলে কবিতার কলাকৈবল্যবাদী কাব্যবিশারদ অথবা কবিতার ব্যাকরণবিদের জন্য তিনি যে কবিতা লিখেননি তা স্পষ্ট। কবিতা তিনি লিখেছেন সময় ও সমাজ তাঁর কর্ণকুহরে যা তুলে ধরেছেন তা দিয়ে। ফলে আমরা বলতে পারি, বাংলা কবিতার ঐশ্বর্যময় ভুবনে তিনি যে কাব্য-প্রদীপ জ্বালিয়েছেন তা তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান। নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ নগর জীবনের হতাশা, যন্ত্রণা, বিকৃত মানসিকতার চরম বিপর্যয়, দুঃশাসনের রাজনীতি, অপশাসন ইত্যাদি কাব্যের উপজীব্য বিষয়। সমকালীন বাংলাদেশের নানা সংঘাত, আন্দোলন, মূল্যবোধহীনতা, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার কুফল এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিপন্নতা কবিকে কলম ধরতে অনুপ্রাণিত করেছে। মূলত অপরিমেয় মানবপ্রীতিই তাঁর কাব্যপ্রেরণার উৎস। আর এই মানবপ্রীতির সহজিয়া অর্থ হলো সমাজপ্রীতি। ফলে আমাদের আলোচনার জের টেনে আমরা বাংলা কবিতার বহুমাত্রিক প্রতিভাধর কবিদের কবি খ্যাত নির্মলেন্দু গুণকে একজন সাম্যবাদী কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

উপসংহার

নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় সাম্যবাদী ভাবনা তাঁর সাহিত্যকর্মের একটি মৌলিক দিক, যা সমাজের শোষিত, বঞ্চিত এবং প্রান্তিক মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করে। তাঁর কবিতাগুলোতে শোষণ, বৈষম্য এবং পুঁজিবাদী সমাজের অসাম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ পাওয়া যায়, যা সাম্যবাদী দর্শনের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের প্রমাণ। তিনি কেবল সমাজের অন্যায় ও অবিচারকে চিহ্নিত করেননি, বরং একটি শোষণমুক্ত, সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্নকেও তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন। তাঁর কাব্যিক সৃষ্টিতে শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-কষ্ট এবং বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার আহ্বান সমানভাবে মূর্ত হয়েছে। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে যে নির্মলেন্দু গুণের কবিতা শুধুমাত্র সাহিত্যের দিক থেকেই সমৃদ্ধ নয়, বরং এটি সমাজ পরিবর্তনের এক শক্তিশালী মাধ্যম। তাঁর কবিতা বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন চেতনার সঞ্চার ঘটিয়েছে, যা সাম্যবাদী দর্শনের গভীরতা ও প্রাসঙ্গিকতাকে আজও মনে করিয়ে দেয় এবং সমকালীন সমাজের জন্য একটি দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

তথ্যপঞ্জি

ইসলাম, ক. ন. (১৯২৫)। *সাম্যবাদী (চতুর্থ সংস্করণ)*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী ।

ইসলাম, ড. স. (২০২৩, ১০ জানুয়ারি)। *কবিতায় সমাজ বাস্তবতা যেভাবে আসে*। দ্য ডেইলি স্টার। https://bangla.thedailystar.net/literature/news-438806

ওয়াদুদ, ন. (২০২৩, জুন)। নির্মলেন্দু গুণের প্রতিবাদের ভাষা। কালি ও কলম। https://www.kaliokalam.com/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC/

খান, র. (২০১৪, ২১ জুন)। *গুণের কবিতা: সংগ্রামের কবিতা*। বাংলা নিউজ ২৪। https://www.banglanews24.com/print/300852

গুণ, ন. (১৯৮৯)। *রাজনৈতিক কবিতা (প্রথম সংস্করণ)*। ঢাকা: বিভাস ।

গুণ, ন. (১৯৯৩)। *কাব্যসমগ্র (২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ)*। ঢাকা: বিভাস ।

গুণ, ন. (১৯৯৫)। *আমার কণ্ঠস্বর (প্রথম সংস্করণ)*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী ।

গুণ, ন. (২০১১)। *নিবার্চিতা (সপ্তম সংস্করণ)*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী ।

গুণ, ন. (২০১৩)। *মহাজীবনের কাব্য (প্রথম সংস্করণ)*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ ।

গৈরিক, গ. (২০২০, ২১ জুন)। *নির্মলেন্দু গুণের সাক্ষাৎকার*। বাংলা ট্রিবিউন। https://www.banglatribune.com/literature/interviews/629038

চক্রবর্তী, ফ. র. (২০২৩, ২১ জুন)। *প্রতিটি মানুষ জন্মগতভাবেই মার্কসবাদী [সাক্ষাৎকার].* প্রতিদিনের বাংলাদেশ। https://protidinerbangladesh.com/special-news/49728/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%97%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%80

চট্টোপাধ্যায়, ব. (১৯৯১)। *বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)*। সুবোধ চক্রবর্তী (সম্পা.)। কলকাতা: কামিনী প্রকাশনালয়।

জনকণ্ঠ. (২০১৯, ১৪ জুন)। *কবিতার নির্মল জলে অবাধ সাঁতার*। জনকণ্ঠ। https://www.dailyjanakantha.com/literature/news/427876

মজুমদার, অ. (১৯৩৬)। *চর্যাপদ (প্রথম সংস্করণ)*। কলকাতা: নয়া প্রকাশ।

মণ্ডল, চ. (২০২৩, ৩ মার্চ)। *নির্মলেন্দু গুণের কবিতা ও বাংলাদেশের ষাটের ক্রান্তিকাল*। চিন্তাসূত্র।

https://www.chintasutra.com/article/%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE/

মাওলা, আ. (২০০৭)। *চল্লিশের কবিতায় সাম্যবাদী চেতনার রূপায়ণ (প্রথম সংস্করণ)*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী ।

মাহমুদ, আ. (১৯৭৩)। *সোনালী কাবিন (প্রথম প্রকাশ)*। ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার ।

মুখার্জী, অ. (১৯৭২, এপ্রিল)। *সাম্যবাদের ভূমিকা*। ঢাকা: সারওয়ার প্রিন্টিং হাউস।

রহমান, ম. (১৯৯৬)। *নির্মলেন্দু গুণ: উজান তরীর মাঝি (প্রথম সংস্করণ)* । ঢাকা: বিভাস ।

রহমান, স. উ. (২০১৩)। *মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা* (অনুবাদক, *প্রথম সংস্করণ)*। ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী।

রায়, এ. এন. (২০১৭, ফেব্রুয়ারি)। *মার্কসবাদ*। ঢাকা: দ্যু প্রকাশন।

রেজা, আ. (২০২৪, ১১ এপ্রিল)। *সাহিত্যে সাম্যবাদ: মানবিক ও বিপ্লবীচেতনা*। বামিহাল ব্লগ। https://bamihal.blogspot.com/2024/03/AliReza.html

শিপু, ও. র. (২০২২, ২১ জুন)। *অন্ত্যজ শ্রেণি ও কমিউনিস্ট দর্শন*। বাংলা ট্রিবিউন। https://www.banglatribune.com/literature/articles/749560

সুকান্ত, প. (২০১৬, ১৭ এপ্রিল)। *বাংলা কবিতায় সাম্যবাদী চেতনা*। চিন্তাসূত্র। https://www.chintasutra.com/article/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%9A/

সুলতান, আ. র. (১৯৯৪)। *রাজনৈতিক চেতনা বাংলাদেশের কবিতা (প্রথম সংস্করণ)*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী ।

হোসেন, খ. আ. (১৯৯৪)। *বাংলাদেশের কবিতায় অন্তরঙ্গ অবলোকন (প্রথম সংস্করণ)*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী ।